প্রচ্ছদ : ভিয়েতনামের কবি-শিল্পী নুয়েন হা চুং-এর আঁকা স্কেচ অবলম্বনে নির্মলেন্দু গুণ। ভেতরের ছবি পিকাসো থেকে নেয়া।

প্রথম প্রকাশ, ১৯৭১

প্রকাশনায় : হামিদুল ইসলাম, বিউটি বুক হাউস ৩৭, বাংলাবাজার, ঢাকা ১। মুদ্রণে : এ. ডি. এম. খান, দি ক্রাউন প্রেস, ২ শ্রীশদাস লেন, ঢাকা ১।

উৎসর্গ

যাত্রা যখন শুরু হলো শূন্য ছিল সকল পাতা,
তোমার বুকে ফিরেই দেখি পূর্ণ আমার লেখার খাতা
রুশ-ভিয়েতনাম-কাম্পুচিয়ার নীলাকাশে।
এখন আমার হৃদয় ভরা তোমার জন্যে,
সংগৃহীত অভিজ্ঞতার অমূল্য সব মধুর পণ্যে।

যাত্রা যখন শুরু হলো হৃদয় ছিল শুষ্ক-নদী,
জাহাজ তখন পেঁছুত না তীরঅবধি। এখন আমার
কংশজুড়ে বান এসেছে; আটকে-পড়া তরী আমার
তাই ভেসেছে উজান ঠেলে। ভাসতে ভাসতে তরী আমার
পথ পেয়েছে পথে নামার। যে-পথ গেছে তেপান্তরে খুলি'
আমি তোমার জন্যে দু'হাত ভ'রে এনেছি তার ধুলি।

তোমার জন্যে পূর্ণ ক'রে এনেছি আজ ফুলের ডালা,
হে জননী গ্রহণ করো, পরবাসে গাঁথা আমার ভাবনামালা।

সাতই আষাঢ়

আবার এসেছে ফিরে সাতই আষাঢ়।
কালো মেঘে আকাশ ভরিয়ে,
প্রকৃতির চোখে কবিতার কাজল পরিয়ে
সে এসে ডাক দিয়েছে আমাকে—
তার জন্মদিনের উৎসবে।
এতদিন গুরুগুরু মেঘের গর্জনে
মিশেছিল বিদ্যুতের ডাক,
মনে হয়েছিল এ-শুধু ঝড়ের পূর্বাভাস
এ-শুধু শিলা-বৃষ্টির খেলা।

উড়ন্ত মেঘের আঁচলে লুকিয়েছিল
সুন্দরের মুখ, তার দীর্ঘতম বেলা।
শিশুর কান্নার মধ্যে সুপ্ত ছিল তার কণ্ঠস্বর,
নিশ্চলতায় লুকানো ছিল তার ছন্দ—
সে আজ হঠাৎ এসে মিললো আমার
অন্তরের গোপন গুহায়।

পঁচিশে বৈশাখের মায়াবী খোলস ভেঙে
তরঙ্গশিখরস্পর্শী প্রভাত-সূর্যের
প্রথম রশ্মির মতো সে এসে লুটিয়ে পড়লো
সাতই আষাঢ়ের ছড়ানো-ছিটানো মেঘের চূড়ায়।

মাধুরীমণ্ডিত মেঘদল উড়তে উড়তে এসে
পাখা মেলে বসলো আমার
হৃদয় মন্দির আলো ক'রে।
জন্মদিনের আনন্দে উজ্জ্বল হয়ে উঠলো আমার
কল্পনার ব্যথিত আকাশ, সেইসাথে বুঝি
বাস্তবে পৃথিবীও গেলো পাল্টে।
পাখি হয়ে উঠলো গান,

আকাশ হয়ে উঠলো আমার হৃদয়,
মেঘ হয়ে উঠলো মুক্তি।

ছন্দের সতর্ক প্রহরায় বন্দী অনুভব
চঞ্চল ঝর্নার মতো সুউচ্চ পাহাড় থেকে
জল হয়ে নেমে এলো ইচ্ছেমতো পেখম ছড়িয়ে।
দু'কূল ভাসিয়ে দিয়ে নদী ছুটলো সমুদ্রের অভিসারে,
চির-রাখালের হৃদয় বাসনা ছুঁয়ে
গাঁয়ের মেঠোপথে বেজে উঠলো বিরহের বাঁশি।

সাতই আষাঢ় আমাকে দু'হাত ধ'রে
টেনে নিয়ে গেলো মফস্বলের ঐ কাদাভরা পথে,
কাশবনের ছিন্নকুটিরে, যেখানে আমার জন্ম,
আমার আঁতুড়-ঘরের ভেজা মাটি।

অচেনা পাখির বিচিত্র সঙ্গীতে মুখরিত
প্রদোষ বেলার প্রথম চিৎকার
এখনো সেখানে ধ্বনিত-প্রতিধ্বনিত হয়ে ফেরে,
খুঁজে বেড়ায় সাতই আষাঢ়ের এ-কবিকে।
না জানি সে আজ কোন্‌রূপে
এসেছে আমার গাঁয়ে ?
কোন্‌ শাড়ি পরেছে সে ?
কোন্‌ ছন্দে হাওয়ায় দিয়েছে দোলা ?
আজ কোন্‌ রঙে মেতেছে আকাশ কাশবনে ?

প্রশংসাকাতর চিত্ত আজ ভিখিরির মতো
শূন্য-পাত্র হাতে ছুটে যেতে চায়
আমি-শূন্য সেই গাঁয়ের উদ্দেশে।

সাতই আষাঢ় এলে সে আমার কণ্ঠে পরাতো

সদ্যফোটা কদমফুলের ঘ্রাণময় মালা,
কপালে আঁকতো বটপাতার সাদা-কষের টিপ।
আম-জাম-কাঁঠালের অঢেল উপঢৌকনে
আমার দুবৃত্তরসনা করতো তৃপ্ত।
বৃষ্টিমুখরিত দ্বিপ্রহর এনে দিতো গ্রাম্যললনার
মানসিক স্বপ্নের সন্ধান।
তুলসিতলায় বধূরা জ্বালতো মঙ্গলপ্রদীপ,
আকাশ কাঁপিয়ে আজান উঠতো
ভক্ত-প্রাণের রক্তে শিখার মতো।
সকলের অগোচরে এইভাবে ক্রমাগত
আমার জন্মদিনের উৎসব হয়েছে চিহ্নিত,
সাতই আষাঢ় হয়েছে ধন্য।

লাঙল-জোয়াল কাঁধে ভোরের কৃষক
ক্লান্তসিক্ত হয়ে ফিরেছে সন্ধ্যায়।
কালবৈশাখীর ডাকে বৈকালী আকাশ হয়েছে পাগল।
বর্ষার প্রথম বর্ষণের ছোঁয়া পেয়ে
পুকুর ছেড়ে বেরিয়ে এসেছে মাছ—
পড়ার বই ছুঁড়ে ফেলে দুর্বিনীত কিশোর ছুটেছে
সেই পলাতক মাছের সন্ধানে, বনবাদাড় ডিঙিয়ে।
শান্ত-স্থির আষাঢ়ের উচ্চাঙ্গ বর্ষণে
উদ্বেল হয়েছে তার চিত্ত,
অজানাপুলকে শিহরিত হয়েছে তার হৃদয়।
স্বপ্ন এসে বারবার ভেঙেছে রাতের নিদ্রা
ষড়ঋতুর ষড়যন্ত্রের ঢেউ লেগেছে শিরায়,
ষড়রিপু হয়েছে জাগ্রত। আঁটির অংকুর হয়ে
কোথায় লুকিয়েছিল এই কবি ?

হেলায়-খেলায় কেটেছে আমার বেলা,
সন্ধ্যার সূর্যকে ফাঁকি দিয়ে
প্রসারিত হয়েছে আমার দিন;
সংকুচিত হয়েছে আমার রাত্রি।

কত প্রশ্ন রয়েছে উত্তরহীন প'ড়ে
তবুও সামান্য ব'লে ফিরিয়ে নেয় নি চোখ
বনান্তের সদ্যফোটা ফুল।
রক্তজবা, কদম, বকুল-সবাই দিয়েছে ধরা
আষাঢ়ের বিকশিত গোপান-কেশরে।

তারপর উত্তীর্ণ কৈশোরে
একদিন নগরে প্রবেশ করেছে আমার নৌকো।
সময়ের অগ্নিকুণ্ডে ব'সে
দুরন্ত যৌবন বাজি রেখে রচনা করেছি কাব্য,
স্বপ্নকে দিয়েছি মুক্তি। অস্থিমজ্জারক্তবীর্য ঢেলে
শব্দ ছেনে গড়েছি প্রতিমা, সুন্দরের।

তার আদল অনেকটাই মিলেছে আমার গাঁয়ের সঙ্গে।
সে হয় নি ছলনাময়ী নগর-নটিনী উর্বশীর মতো।
তার কোথাও পড়েছে গীতি-কবিতার ধ্যানমৌন ছায়া,
কোথাও নজরুলের বিদ্রোহের দীপ্তি পেয়েছে প্রকাশ,
কোথাওবা সুকান্তের শ্রেণী-ঘৃণা পেয়েছে প্রাধান্য।

প্রতারক সুন্দরের সংস্কার নিগড়ে
আবদ্ধ হয় নি তার রূপ।
জীবনের অনুগত করেছি শিল্পকে,
কল্পনার চেয়ে বাস্তবকে দিয়েছি মর্যাদা।
গোলাপের চেয়ে কাঁটাকে এঁকেছি বড়ো ক'রে,
শোষণের হিংস্রতার কালি দিয়েছি মাখিয়ে
সুন্দরের মুখের লাবণ্যে।

সুপুষ্টস্তনের সাথে জোড়বেঁধে দিয়েছি অপুষ্টস্তন,
অক্ষরের যথেচ্ছ খোঁচায় দিই নি ঘুচিয়ে

পার্থক্যের সীমা।
সামাজিক সত্যকেই বলেছি সুন্দর।

দাভিঞ্চির মোনালিসা সে হয় নি ব'লে
আমার আক্ষেপ নেই কোনো।
কাশবনের সেই কৃষককন্যার গোপন ব্যথার
একটি কণাও যদি প্রতিফলিত হয়ে থাকে
আমার কাব্যের প্রতিমায়,
যদি তার বিপুল ঘৃণার একটি স্ফুলিঙ্গও
প্রজ্বলিত হয়ে থাকে আমার ঘৃণায়,
যদি তার গোপন স্বপ্নের একটি পাপড়িও
প্রস্ফুটিত হয়ে থাকে আমার ভালোবাসায়,
জানি, একদিন তোমাদের প্রেমে, প্রশংসায়
অভিষিক্ত হবে আমার কবিতা,
ধন্য হবে সাতই আষাঢ়।

আপাতত আষাঢ়ের নীরব নির্ঝরে
জ্বলুক আমার জন্মদিনের একলা-শিখা।

বাঙলাবাজার

এখানে আকাশ আড়াল করেছে গ্রন্থ,
এখানে সময় বন্দী হয়েছে প্রচ্ছদে।
এখানে সকল স্বপ্ন পেয়েছে মুক্তি,
এখানে সকল দ্রোহ পেয়েছে ভাষা।

পুণ্যতোয়া বুড়িগঙ্গা-তীরে এই সেই পুণ্যস্থান,
বাল্মীকির সিদ্ধতপোবন। উত্তপ্ত মরুর মাঝে
যেন একখন্ড স্নিগ্ধ মরূদ্যান, এই বাঙলাবাজার।

নীল দর্পণের লালকুঠি আর
সিপাহী বিদ্রোহের অম্লান সৌধ দিয়ে ঘেরা
আমাদের উজ্জ্বল উদ্যান, এই বাঙাবাজার

মিছিলে ঝরেছে রক্ত...
বাঙলাবাজারে তার ইতিহাস বাঁধাই হয়েছে।
শ্রাবণ-আকাশ যখন ঢেকেছে মেঘে
বেদনার অনুকূল রঙে, বসন্ত বাতাসে
যখন ফুটেছে ফুল বাঙালীর মনে –
বাঙলাবাজারে তার কাব্যরূপ বাঁধাই হয়েছে।

আমাদের আনন্দ-বেদনা, জয়-পরাজয়,
আমাদের ধর্ম, প্রেম, প্রত্যহের ক্ষয় –
হ্যান্ডকাস্টে, লাইনো-মনোতে
পেয়েছে অক্ষয়রূপ, নিশ্চল-নিশ্চুপ।

সমুজ্জ্ব   নক্ষত্রে মতো গ্রন্থপুটে
এখানে   াদের নাম জ্বলজ্বল ক'রে জ্বলে;

তাদের নামের পাশে, মুগ্ধ ছায়াতলে
একদিন আমিও ছিলাম।

ব্যর্থ হোক, ঝ'রে যাক্, না হোক অক্ষয়—
তবু, সেই হোক আমার গর্বিত
শেষ-পরিচয়।

জানি, আমি-শূন্য এই তপোবনে
আসবে নতুন কবি। ফুটবে নতুন ফুল।
মব পাণ্ডুলিপিখানি প্রকাশের তরে
খুঁজবে নতুন প্রকাশক।

রৌদ্রদগ্ধ সেই দ্বিপ্রহরে
বাঙলাবাজারের উদাস ধূলিতে
আমার অংকিত শেষ-পদচিহ্নে
যেন তার পদচিহ্ন পড়ে।

খাজাঞ্চীবাবুর নববর্ষ

দেখতে-দেখতে আরো একটি চৈত্র প্রায় শেষ হলো,
আজ সংক্রান্তি, কাল থেকে বৈশাখের শুরু।
খেরো-খাতার হিসেবের পাতা উল্টাতে উল্টাতে
ভাবছেন খাজাঞ্চীবাবু,—এরই মধ্যে নাকের ডগায় ঝোলা
সুতোবাঁধা চশমার লেন্স বদলাতে হলো বার তিনেক।
তবু তার হিসেব মিলছে না—শুধু দুশ্চিন্তা হচ্ছে বারবার।

এদিকে উদ্বিগ্ন মহাজন সতর্ক ভ্রূকুটি হেনে আছেন তাকিয়ে
যেন একজোড়া আন্তঃমহাদেশীয় ক্ষেপণাস্ত্র,
কখন আঘাত হানবে কে জানে ?
খাজাঞ্চীবাবু ভাবেন, আজ এই সংক্রান্তির পুণ্য-রজনীতে
মহাজন গদিতে যদি তার মৃত্যু হয়, তাও ভালো।
বিবাহযোগ্যা দুই মেয়ে সুজলা-সুফলা আর নাবালক
দুই পুত্র যদু-মধুকে নিয়ে বিধবা হবেন স্ত্রী অন্নপূর্ণা।
আমার কী ?
আমি দিব্যি বৈতরণী পাড়ি দিয়ে চ'লে যাবো ঈশ্বরের
নিজের মোকামে—তাঁর স্থাবর-অস্থাবর সহায় সম্পদের
হিসেব মিলাবো অন্য এক খেরো-খাতায়।

আর ভাগ্য যদি সুপ্রসন্ন হয় চিত্রগুপ্তের কাজটাই যাবো পেয়ে,
এক দু'বছর তো নয়, দীর্ঘ দুইশ'প'য়ত্রিশ বছরের অভিজ্ঞতা।
চিত্রগুপ্তের কী এমন বেশি ? তাছাড়া ঐ চিত্রগুপ্ত ব্যাটারওতো
বয়স হলো ঢের—আর কতদিন ?
তার এখন রিটায়ার করা দরকার।

না জানি চিত্রগুপ্তের সেই বিখ্যাত খাতাটি কেমন হবে !
ভাবেন খজাঞ্চীবাবু,—
সে কি এই মহাজনের খেরো-খাতার মতো ?
জীর্ণ সুতলিতে বাঁধা ? নিশ্চয়ই নয়। অবশ্যই এর
পাতাগুলো হবে সোনার পাতের তৈরী,

মহাজন-গিন্নির মতো একেবারে গিনি-সোনার গহনা দিয়ে মোড়া।
চুনী-পান্নার ঢাউস দোয়াতে ভরা থাকবে চিরস্থায়ী কালি—
আর সেই কালিতে ডোবানো থাকবে একটা চকচকে হীরের কলম।
কী মজাই না হবে সেই কলম দিয়ে লিখতে।

কিন্তু কী বর্ণ হবে সেই কালির?
লাল?
কালো?
নীল?
—এই রঙের কাছে এসেই খাজাঞ্চীবাবুর কল্পনারা থমকে দাঁড়ালো।
যদি সেই কালি হয় হাসির আড়ালে লুকানো অন্নপূর্ণার
টলটলে চোখের জলের মতো?
যদি সে-অশ্রুর স্পর্শে হীরার কলমখানি গ'লে যায়?
সে কি বেকার হবে স্বর্গে পুনর্বার?

মর্ত্যে তবু সয়, স্বর্গে তার দণ্ড সইবে না, ভাবেন খাজাঞ্চীবাবু—
কোনোক্রমে চাকরিটা আগে হোক তারপর দেখে নেবো এই
পৃথিবীকে। কলমের এক খোঁচায় মহাজন ব্যাটাকে দেবো
দুর্নীতির অভিযোগে ফাঁসিতে ঝুলিয়ে। আর অন্নপূর্ণাকে
দেবো টকটকে লাল পাড়ের একখানি নববর্ষের শাড়ি।
আহা বেচারি হয়তো ভুলেই গেছে এদ্দিনে নতুন লাল পাড়ের
ঢাকাই শাড়িতে কী সুন্দরই না ওকে মানতো একদিন।

খেরোখাতার পাতা ফুরোতে চায় না, রাত বাড়ে—
কল্পনারা হার মানে দুর্বিষহ বাস্তবের কাছে।
কুঁজো পিঠে টনটন করে ব্যথা, চোখ ঝাপসা হয়ে আসে
অর্থহীন যোগ-বিয়োগের ভিড়ে।
শুভ্রহাতে কালোটাকা গুণতে গুণতে ক্লান্ত মহাজন
সুকৌশলে ছুঁড়ে দেন কৃত্রিম অভয়—
খাজাঞ্চীবাবু জানেন ওটা তো অভয় নয়, তাড়া।
অনেক চৈত্র দেখে দেখে আজ তার এইসব চেনা হয়ে গেছে।
জানা হয়ে গেছে সব। বোঝা হয়ে গেছে সব।
অর্থহীন সততা আর নির্ভুল নিষ্ঠায় মোড়া কণ্টকিত
জীবনের বোঝা বইতে বইতে তিনি এখন ক্লান্ত, বিধ্বস্ত, বীতশ্রদ্ধ।

আজ তিনি বিদ্রোহী হতে চান।
শোষণের সমস্ত নিগড় ভেঙে
তিনি এখন এগোতে চান এক নতুন সমাজের দিকে।
তার রক্তের মধ্যে তীব্র ঘৃণা দানা বেঁধে ওঠে,
স্ত্রীর জন্যে বুকের মধ্যে জেগে ওঠে সুপ্ত ভালোবাসা,
সন্তানের জন্য উথলে ওঠে অপার মমতা -হায়,
এইভাবে তিলে-তিলে দন্ডে-দন্ডে জীবনের ক্ষয়,
এতো পরাজয়, এতো অপচয়—
আর নয়, আর নয়, আর নয়।

তিনি এবারে লিখবেন অন্য এক খেরোখাতায়,
আঁকবেন অন্য এক জীবনের ছবি
যেখানে সমুদ্র এসে ছোট ছোট নদীতে মিশেছে।

একটি খোলা-কবিতা

আসুন আমরা আগুন সম্পর্কে বৃথা বাক্য
ব্যয় না ক'রে একটি দিয়াশলাইয়ের কাঠি
জ্বালিয়ে দিয়ে বলি—'এই হচ্ছে প্রকৃত আগুন।'

মীটসেফ খোলা রেখে, বিড়ালকে উপদেশ দিয়ে
অযথা সময় নষ্ট ক'রে লাভ নেই—আসুন,
আমরা মীটসেফের দরোজাটা বন্ধ করে দিই।

পুঁজিবাদী শোষণের পথ খোলা রেখে
সম্ভব নয় মানুষকে প্রকৃত মুক্তির স্বপ্ন দেখানো।
ফুটো চৌবাচ্চায় জল থাকবার কথা নয়,
সে বেরিয়ে যাবেই—ওটাই জলের ধর্ম।
আমাদের ধর্ম ভিন্ন হলেও টাকার ধর্ম একই।

বুদ্ধিমান কৃষক তাই আগাছা উপরে ফেলে সময়মত,
নইলে তার কষ্ট-বর্ধিত জমিতে কি ফসল ফলতো ?
পরগাছার আক্রমণ থেকে ফলবান বৃক্ষকে
রক্ষা করতে হয় পরগাছার গোড়া কেটে দিয়ে।

রক্তচোষা জোঁকের মুখে দিতে হয় থুথু, অথবা চুন,
প্রচণ্ড আঘাত ছাড়া পৃথিবীতে কবে কোন্ দেয়াল ভেঙেছে ?
পরশ্রমভোগী ধনিক শ্রেণীর সর্বনাশ ছাড়া
দরিদ্রের পুষ্টিসাধনের সংকল্প হচ্ছে এক
চমৎকার অলীক কল্পনা।

সুফল লাভ কি সম্ভব সৎকর্ম ব্যতিরেকে ?
কিম্বা শস্য ভূমিকর্ষণ ছাড়া ?

হাতুড়ে বৈদ্য গ্যাংরিন সারাতে চান ক্ষতস্থানে
পুরনো ঘি মালিশ ক'রে—
শিক্ষিত ডাক্তার পরামর্শ দেন অপারেশনের।

তাতে কিছু রক্তপাত হয় বটে, হয়তো কেটে ফেলতে হয়
কোনো প্রিয় অঙ্গ—কিন্তু ব্যাধি থেকে মুক্তির জন্য
ওটা এমন কিছু নয়। এর কোনো সহজ বিকল্প নেই।
এটাই নিয়ম।

আসুন কথার ফুলঝুরিতে চিড়ে ভেজানোর ব্যর্থ চেষ্টায়
সময় নষ্ট না ক'রে আমরা প্রয়োজনীয় জলের কথাই বলি।

বেকারদের ঈদ

জীবনে যাঁদের হররোজ্ রোজা
তাঁরাও চাদের সমান অংশীদার।

লুট করা ধনে আমীর বনেছে যারা
তাদের জন্য পৃথক আকাশ নেই।

তাই দেখি এই উদার আকাশে
এখনো ঈদের একটাই চাঁদ ওঠে।

হয়তো কালও সে ভিক্ষা-পাত্র হাতে
ছুটবে ধনীর দুয়ারে বস্ত্রহীন।

হয়তো ঈদকে মনে হবে তার
শুধুই জাকাত ফেতরা পাবার দিন।

তবু আনন্দ হবে তারও ঢের জানি,
ঈদের চাঁদতো তাকেও আকাশে
দিয়েছিল হাতছানি।

আপাতত নয় থাক সে পরের ঘরে,
তবু সে থাকুক—
দূর থেকে দেখে যেটুকু পরান ভরে
তার মূল্যও ফেলনা নয়তো কিছু।

হায়রে ঈদের চাঁদ, তোমার তলায়
ধর্মের নামে মানুষ পেতেছে ফাঁদ।

ফাঁদ পেতে পাওয়া আনন্দে যারা
খুশবু ছড়ায় ঈদে—
তাদের দয়ায় মিটবে না এই
বুভুক্ষুদের খিদে ;

শতহাতে কেড়ে একহাতে দেয়া
মুষ্টিভিক্ষা বুঝি—

কেবলি বাড়াবে বেহেশ্‌ত-লোভী
ধনীর পুণ্য-পুঁজি।

এ-পুঁজি খাটিয়ে পার হওয়া যাবে
পুলসিরাতের পুল,
একথা কোথাও বলেন নি কভু
আমার প্রিয় রসুল।

তিনি বলেছেন ভাগ করে নিতে,
সকলের মাঝে ভাগ করে দিতে
আনন্দ বেদনাকে।

মুখে ইসলাম আল্লাহ্‌-রসুল
কোরান হাদিস হুজরুকি,
বুকে বেসুমার ভোগের স্বপ্ন
ধর্মের নামে বুজরুকি।

বলেছেন নজরুল, আমি বলি ফের—
এ নহে বিধান ইসলামের।

জীবনে যাদের হররোজ রোজা,
তারাও ঈদের সমান অংশীদার।

পোর্ট-স্ট্যানলীতে আর্জেন্টাইন বাহিনীর পরাজয়ের সংবাদে

যতটা আন্দাজ করা হয়েছিল, তবে কি
ততটা বৃদ্ধ হয় নি বৃটিশ-সিংহ ?
মরণপণ যুদ্ধে সে পুনর্দখল করে নিয়েছে
ফক্ল্যান্ডের পুরনো তালুক।
আপাতত পরাভূত আর্জেন্টিনা।

হায় পোর্ট-স্ট্যানলী। বৃটিশ দস্যুরা
এখন তোমাকে ঘিরে
কী বাঁদর নাচটাই না নাচবে।

হয়তো বা অচিরেই উদযাপিত হবে বিজয়-উৎসব।
পোর্ট-স্ট্যানলীর রঙ্গভবনে
মুমূর্ষু সাম্রাজ্যবাদের দীর্ঘায়ু এবং সুস্বাস্থ্য
কামনা ক'রে
সুরাপানে মত্ত হবে আমন্ত্রিত অতিথিরা।
শ্রীমতী থ্যাচারের ডানা ধ'রে নাচবেন
শ্রীমান রীগান—
ইউরোপীয় কমন মার্কেটের উৎফুল্ল সদস্যবর্গ
সেই নৃত্যের তালে তালে দেবে হাততালি ঃ
জয় উপনিবেশবাদ,
জয় ধনতন্ত্র।

আর পরাজয়ের গ্লানিতে ন্যুব্জমুখ
আর্জেন্টাইন বাহিনীর
অশ্রুসিক্ত চোখ ধুয়ে দেবে আটলান্টিকের
ব্যথিত তরঙ্গমালা।

হায় গাল্টিয়ারী, হায় কোস্টামেন্ডেজ,
হায় কেম্পেস, ম্যারাডোনা,
হায় বুয়েন্স এয়ার্স।

তোমরা আমার ব্যথিতচিত্তের
অশ্রু থেকে উচ্চারিত এই কবিতাটি
গ্রহণ করো।

পররাজ্যগ্রাসী বেনিয়া বৃটিশের বিরুদ্ধে
আমি ছিলাম তোমার সমর্থক।
তোমাদের লক্ষ্যভেদী ক্ষেপণাস্ত্রের ঘায়ে
আটলান্টিকের ঊর্মিমালায় যেদিন
নিমজ্জিত হলো বৃটিশ ফ্রিগেট,
সেদিন কী আনন্দই না হচ্ছিল আমার।

হোক না তা ক্ষণস্থায়ী, তবু সেই প্রজ্বলন্ত
ফ্রিগেটের অগ্নিঝলকে –
সেদিন ঝলসে গিয়েছিল শক্তিমদমত্ত
আধিপত্যবাদীদের অহংকারী মুখ।

পরাজয় কিছু নয়,
পোর্ট-স্ট্যানলীর দুর্গ-চূড়ায় আমি দিব্যি দেখতে পাচ্ছি
ফকল্যান্ডের মুক্ত-পতাকা।

ভলগা ও লেনিন

তুমি ছিলে লেনিনের নদী, লেনিন-জননী,
এখন সমগ্র বিশ্ব তোমার সন্তান।
তোমার প্রশান্ত স্রোতে করে স্নান পৃথিবীর
নব-পুণ্যার্থীরা,
তোমার মঙ্গলঘটে ঢালে জল সকল নদীরা।

কোথায় তোমার জন্ম ?
হোক না তা ভালদাই কিম্বা হিমালয়।
আপাতদৃষ্টিতে হয়তো মিশেছো তুমি
দূর কাস্পীয়ানে—
ওটা কিছু নয়।
তোমার গর্ভপ্রতিম জলের ভিতরে একদিন
সুপ্ত ছিল স্টিপেন রাজিন, পুগাচেভ,
গোর্কি আর লেনিনের ভ্রূণ।
তাই নব-সভ্যতার প্রথম প্রসূণ
তুমি উপহার দিলে পৃথিবীরে,
ওটাই স্মরণে থাক্ মানুষের।

হে ভলগা, হে পূর্ণসলিলা ভলগা,
পুত্রশোকে মুহ্যমান মাতা মারিয়ার
অশ্রুপ্লাবিত ভলগা, মৌন-শান্ত
প্রশান্ত মূরতি হে সুনীলনয়না ভলগা,
তোমার উদ্দেশে আজ রেখে যাই
আমার প্রণতি।

এই শীতের সন্ধ্যায় তোমার উদারবক্ষে
আমার অশ্রুর অর্ঘ বরফকুচির মতো
ঝ'রে, গ'লে যেন মিশে যায়—
যেভাবে সমুদ্রে মেশে নদী,
তোমার সলিলে কান্না,
কিম্বা ঝরাপাতা যেরকম নব-মৃত্তিকায়।

অগ্রজ দাদার সাথে ছোট্ট ভলোদিয়া
তোমার উদ্দাম বক্ষে একদিন
ভাসাতেন তরী,
তাঁদের বিপ্লবী প্রাণ উঠিত শিহরি
যে গানের সুরে--যে গানের টানে ডিঙি
তরী ছেড়ে ভেসে যেতো দূরে,
সে-গান শোনাও আজ কংশতীরের
এই মুগ্ধ অতিথিরে।

আজ বিপ্লবের লালচেলি পড়েছে রাশিয়া,
কাল তার বিজয়উৎসব।
দুঃসহ শোষণে শীর্ণ স্বদেশ আমার,
তার গায়ে বিধবার শতছিন্ন শাড়ি—
তীরে জীর্ণবাস অপুষ্ট শ্রমিক, বুভুক্ষু কৃষক
আর ভাঙা ঘর-বাড়ি।

তোমার তরঙ্গভঙ্গে জানি আছে শিকল ভাঙার মন্ত্র,
সে-মন্ত্র বলেছো তুমি লেনিনের কানে।
তাঁর হৃদয়ে দিয়েছ দোলা—
দুর্বাশার মতো তাঁর প্রাণে জেবলেছো মশাল।
কবির অমর্ত্য স্বপ্ন, বন্দী সমকাল
লেনিনে পেয়েছে মুক্তি।

পররাজ্যগ্রাসী বণিক দলের চূর্ণ পরাভবে
জাগ্রত হয়েছে পৃথ্বী নবস্বপ্নে, নবীন বৈভবে।
তাই, প্রতিদিন অবিচ্ছিন্ন সূত্রে গাঁথা দুই নাম
অবিচ্ছিন্ন মনে হয়—'ভলগালেনিন'।

মনে হয়, ভালদাই থেকে নয়,
ভলোদিয়া থেকে ভলগা এসেছে নেমে,
তারপর এঁকেবেঁকে মিশেছে লেনিনে।

মনে হয়, মাতা মারিয়ার মাতৃগর্ভ নয়,
ভলগার মাতৃ-জলরাশি উগলে দিয়েছে
এ অভূতপূর্ব শিশু,
একই সঙ্গে যে নদী ও মানুষ।

যখন সে নদী—তখন ভলগা,
যখন মানুষ—তখন লেনিন।

লেনিন মুসোলিয়াম

আমার চক্ষুদ্বয়কে বলি প্রসারিত হও, অধীর হয়ো না,
স্থির হয়ে দেখো, প্রাণ ভ'রে দেখো : 'এইতো লেনিন'।

একদিন সিদ্ধিদাতা গণেশের ছবির উপরে যাঁর ছবি
দেখেছিলে কল্পলোকে অতিদূরে নক্ষত্রের মতো—
আজ সেই নক্ষত্রের আলো লুটিয়ে পড়েছে এসে
তোমার দু'চোখে।
যার মুখ হৃদয়ে সতত বহন করেছো তুমি গভীর বিশ্বাসে,
আজ তাঁর মুখোমুখি এসে সবচেয়ে নিঃশব্দে দাঁড়াও।
কাঁপে না চোখের পাতা, শান্ত হও, শান্ত হও, সখা।

ভুলে যাও তুমি কোথা থেকে এলে,
ভুলে যাও তুমি কত দূর থেকে এলে,
মনে কর এই বিপ্লবীর বিপুল জীবনে
আদ্যন্ত জড়িয়ে ছিলে তুমি।
মনে কর তোমার শরীর এক আশ্চর্য সুন্দর কাসকেট,
তার অভ্যন্তরে শুয়ে আছে জীবন্ত লেনিন,
যেন মাতৃগর্ভে প্রাণবন্ত শিশু।
বীজের ভিতরে যেন মৃত্যুহীন প্রাণের অঙ্কুর।

হে আমার চোখ, অধীর হয়ো না। তুমি, দেখো
এরচে' সুন্দর দৃশ্য, এর চেয়ে নয়ন ভোলানো কোনো ছবি
পৃথিবীতে আর নেই।

হে অনভ্যস্ত পা আমার, স্থির হও, বোকামী করো না,
চোখের নির্দেশ মেনে চলো।
ধীরে, খুব ধীরে-ধীরে হাঁটো –যেন না ফুরিয়ে যায় পথ।
যেন না-হারিয়ে যায় এই লেনিন প্লাবিত শোভা
তোমার পশ্চাতে।
বলো, আমি কী করবো ? আমি কী করবো ?

আমার চোখ চলছে না...
আমার পা চলছে না...আমি...
অনেক দূরের পথ পাড়ি দিয়ে এখানে এসেছি,
আমাকে দাঁড়াতে দাও বন্ধু।
আরো কিছুক্ষণ আমাকে দেখতে দাও তাঁকে।

ক্রেমলিন ফটক আগলে অনন্ত সুপ্তির মাঝে
তিনি শুয়ে আছেন, যেন এ-যুগের ধ্যানমগ্ন
বাল্মীকি আমার।
তাঁর চারপাশে নিস্তব্ধ সময় মাথা নত ক'রে
কুর্নিশ করছে তাঁকে।
তিনি ভাবছেন, ভাবছেন আর ভাবছেন।

তাঁর স্ফুরিত মেধার মুখ উদ্ভাসিত আশার আলোয়,
না-বলা কথায় স্পন্দমান,
যেন সেই অনির্বাণ দীপশিখা তিনি
অন্ধকার রাত্রি যার আলোর কাঙাল।

জীবনের প্রথম বরফ

ঘুম ভাঙলো বরফের ডাকে।
জীবনের প্রথম বরফ।
আনন্দের শুভ্রকুচি নিয়ে
উড়ে আসা ভোরের বাতাস
জানালার কাঁচ ফুঁড়ে চকিতবিদ্যুৎ বেগে
ঢুকলো হৃদয়ে।

অভিজ্ঞ বার্চের বন
অনভিজ্ঞ কবির মতন তার চিরল পাতায়,
কাণ্ডে, শাখা-প্রশাখায়
বেঁধে নিলো বরফের শ্বেতশুভ্র চূড়া।
মস্কোর অনূঢ়া আকাশ
যেন দীর্ঘ অপেক্ষার শেষে আজ
দেখা পেলো আকাঙ্ক্ষিত শুভ্র-সুন্দরের।

খুলে দাও বরফের আলপনা আঁকা
হোটেলের সমস্ত জানালা।
খুলে দাও আমার পোশাক—
আমাকে আবৃত ক'রে আজ শুধু বরফ ঝরুক
.........................সারাদিন।

আমি আজ কোথাও যাব না,
আজ শুধু বরফের সাথে খেলা।

পথের পিচের মতো ঢেকে দিক বরফ আমাকে।
আমার হৃদয় হোঁক তেমোদের প্রিয় খাদ্য,
মাখন-মাখানো কাস্তারুটি।
'হ্যালো বাংলাদেশ', 'হ্যালো বাংলাদেশ' ব'লে
আমাকে ডেকো না আর বন্ধু।
আমি আজ বরফ আবৃত বার্চবন,

সবুজ কুমারী ইয়োল্‌কা,
আমি আজ উন্মোচিত ভবনের ছাদ,
টুলিবাস, চলমান রাশিয়ার টুপি।
আমার হৃদয় আজ আন্দোলিত
কাঁচের জানালা,
আমার মাথার চুলে আজ শুধু
বরফ, বরফ।

এসো আমার ঘরে এসো, আমার ঘরে।
যারা আছে ভয়ে দ্বার বন্ধ ক'রে—
তাদের পশ্চাতে ফেলে তুমি এসো
আমার উন্মুক্ত বক্ষে, তৃষিত হৃদয়ে।

আমাকে আবৃত করো, আমাকে জড়াও,
ঐ ইয়োল্‌কার সবুজ পাতার মতো ঢেকে দাও
আমাব সবুজ স্বপ্ন, দীর্ঘ বঙ্গদেশীয় শরীর।
বরফের মুগ্ধ আলিঙ্গনে
প্রেমিক কবির চিত্ত আজ প্রতিদ্বন্দী হোক
এই নব-প্রকৃতির।

আমার এশীয় চুলে আজ পূর্ব-য়ুরোপের
বরফ ঝরুক সারাদিন, সাবাদিন......
সা
রা
দি
ন...

হ্যানয়ে শেষ-রাত্রি

এখন প্রায় ফুরিয়ে এসেছে রাত্রি,
কাল আমরা চ'লে যাবো।
অনেক উঁচু আকাশের মেঘ ছুঁয়ে
উড়ে যাবে আমাদের বিমান।

ক্রমউড্ডীন সেই বিমানের অপসৃয়মান
জানালায় চোখ রেখে শেষবারের মতো
আমি দেখবো তোমার মুখ। উড়ন্ত মেঘের নিচে
ক্রমশ হারিয়ে যাবে তুমি।

'লাল নদী' আর সবুজ পাহাড়ের বুকচেরা
আঁকাবাঁকা বনপথগুলি ছাড়া
কিছুই চোখে পড়বে না।
অনেক মুখের ভিড় ডিঙিয়ে হয়তো দেখবো
হঠাৎ তোমার মুখ—
কিন্তু ততক্ষণে আমি চ'লে যাবো
তোমার সকল দেখার বাইরে।

এই চন্দ্রধৌত হোটেলের মতো এখন তুমি
ঝিলের জলে তোমার মুখখানি দেখো,
কাল দেখবে আমার চোখের জলে।
কাল আমি তোমাকে হারাবো,
কাল তুমি আমাকে হারাবে ..।

একথা ভেবে, তবুও আনন্দ পাচ্ছি মনে,
এর মধ্যেই নিহিত রয়েছে
আমার স্বদেশ ফিরে পাওয়ার স্বপ্ন।
আমাকে স্বদেশের বুক থেকে,
আমার চঞ্চলা কন্যা, প্রিয়তমা পত্নী,

বন্ধু-পরিজন, আর গাছপালা থেকে
ছিনিয়ে এনেছো তুমি।
অনেক আকাশ ঘুরে আমি একদিন
তোমাকে দেখতে এসেছিলাম—
কথাটা মনে রেখো।

কাল তোমাকে আমি আমার দেশের
স্বাধীনতার গল্প শুনিয়েছি,
রবীন্দ্রনাথের গানে ভরিয়ে দিয়েছি
তোমার যুদ্ধবিধ্বস্ত সাহসী আকাশ।

যাবার সময় কোনো কথা বলো না,
দুঃখ পেয়ো না যেন লক্ষ্মীটি আমার।
তুমি তো প্রস্তুত ছিলে সারাক্ষণ
তোমার ঐ স্নেহমাখা সুধাহাসি নিয়ে
তাই রমণীয় শুশ্রূষায় ভরিয়ে দিয়েছো মন।
স্বপ্নের ভিতরে এসে স্বপ্ন হারিয়ে ফেলা
ক্লান্ত-পথিক আমি নই, তবু এই
রাত্রি শেষের লগ্নে, এই নির্ঘুম রজনীতে,
হ্যানয়, মনে হয় ভিতরে কোথাও
লেগেছে ক্লান্তির দোলা।
তুমি তাকে মুছে দিও বোন।

স্বদেশ অদর্শনক্লান্ত পথিকের মর্মের ভিতরে
মনে হয় পাথর ছুঁড়েছে কেউ;
তার ঢেউ উঁচু হয়ে আকাশ ছুঁয়েছে।
কাল যখন আমি চ'লে যাবো,
তুমি সেই ঢেউয়ের ভিতরে দেখবে আমার
পানকৌড়ি-মুখ ভাসছে আর ডুবছে।

হে। চি মিন পুকুরের ঐ ছলনাময়ী
মাছগুলির মতই তুমি ধরা দাও নি আমাকে;
শুধু দেখা দিয়ে পালিয়ে বেড়িয়েছো।
কথাটা মনে রেখো।

এখন তুমি ঘুমোও, কাল যখন আমি
চ'লে যাবো তুমি আমার মুখ দেখবে
তোমার চোখের জলে।

বৃষ্টির বিরুদ্ধে

ভাঙা-ইটের তিনটি খণ্ড
ত্রিভুজকারী,
তার উপরে মাটির ভাণ্ড
ভাতের হাঁড়ি।

হাঁড়ির জলে উপুর আকাশ
কালোমেঘের ছায়া ফেলছে,
সামনে ব'সে রুগ্নহাতে
ভিখিরিণী আগুন ঠেলছে -
মোটামুটি দৃশ্যটা এই।

হঠাৎ ক'রে আকাশটিরে
আঁকাবাঁকা বজ্রে চিরে
বৃষ্টি নামলো অঝোর ধারায়,
সাথে প্রবল ঝড়ো হাওয়া।

অতর্কিত আক্রমণে
দিশেহারা পথিক যত,
সবাই ছুটলো যে-যার মতো
পথের পাশে মাথা গুঁজতে।

বিপদ হলো ঐ মেয়েটির,
তখনো তার ভাত ফুটে নি।
সবেমাত্র হাঁড়ির জলে
চালের ওঠা-নামা চলছে;
হাঁড়ির নিচে খোলা-হাওয়ায়
তুষের মতো আগুন জ্বলছে
ধিকিধিকি সেও যেমন।

আগুন কি আর হাওয়ার মুখে
খোলা-চুলায় বন্দী থাকে ?
জলে ভিজে হাওয়ার তাড়ায়
লকলকে জিভ্ বাইরে বাড়ায়।

তবুও সেই ভিখিরিণী
বৃষ্টি থেকে আগলাতে চায়
তার হাঁড়িটি। মুরগী যেমন
ডানার তলে লুকায় ছানা।

হাওয়া এবং জলের সাথে
যুদ্ধ চলে ভিখিরিণীর।
আমরা ডাকি : 'চলে এসো,
মরবে নাকি বজ্রাঘাতে ?'
ভিখিরিণী ডাক শোনে না
চিতার সামনে বসে থাকে
শৈব্যা যেমন শ্মশানঘাটে
মধ্যরাতে।

সকল চেষ্টা চূর্ণ ক'রে,
শূন্য হাঁড়ি পূর্ণ ক'রে
উপচে পড়ে জল -
ভিখিরিণীর দু'চোখ তখন
অশ্রুতে টলমল।

আমরা ডাকি : 'চলে এসো,
আর কী হবে থেকে ?'
মেয়েটি সেই ডাক শোনে না.
বজ্রকাঁপা অভিমানে
আকাশটিকে দেখে।

তখন আমার বৃষ্টিকে খুব
পাষাণ মনে হয়।

মশারি

প্রত্যহ রাতে ঘুমোবার আগে
শুরু করি আয়োজন।
যত্নে লেখার কলম বন্ধ করি,
ওটাই আমার শ্রেষ্ঠ অস্ত্র জানি।
কবিতার খাতা, বইপত্তরগুলি
সাজিয়ে টেবিলে রেখে
দেখি দরজার সিঁটকিনি ঠিক
আটকানো হলো কিনা।

আলোটা নিবাই সুইচে আঙুল চেপে,
আঁধার ঘনায় সমস্ত ঘরব্যেপে।
মশারিটা ফেলি ভিতরে বসেই
নইলে মশার কামড়ে ঘুমটা মাটি।

তখন হঠাৎ মনে পড়ে সেই
সান্টিয়াগোর জেলের গল্প,
বিছানাটা যেন মাছের জন্য
বিখ্যাত কোনো নদী।
আমি যেন এক মৎস্যশিকারি,
মশারিটা যেন জাল।

নরম বালিশে শক্ত মাথাটি রেখে
তারপর দিই সারারাত্রির ঘুম।

ঘুম ভেঙে যায়, আঁধার পালায়,
পাখির কন্ঠে নতুন সকাল জাগে—
সেই সাথে আমি।
ভোরের তরুণ হাওয়া ছুটে এসে
মশারির বুকে লাগে।
নড়ে ওঠে জাল, মনে হয় তাতে
পলাতক কালবাউস পড়েছে ধরা।

কোথায় মৎস্য ? কোথায় মৎস্য ?
দেখি রাত্রির সেই গো-বৎস্য
আট্‌কা পড়েছে নিজেরই পাতানো জালে।
অন্যেরা কেউ দেখার আগেই
মশারিটা ফেলি তুলে।

সিন্ধুমাতা

আদিতে সমুদ্র ছিল বড় বেশি নিঃসঙ্গ একাকী।
হাঙর তিমির দল কিম্বা সামুদ্রিক মাছের দঙ্গল
তখনো আসে নি। হিমছড়ি কিম্বা আদিনাথের মন্দির
তখন ছিল না। ইঞ্জিনচালিত নৌকো, জেলের সাম্পান
অথবা দিগন্তচেরা বিদ্যুৎচমকে দৃশ্যমান
কোনো জাহাজের ছবি তখন কল্পনাতীত।
ফুঁসে-ওঠা সমুদ্রের ঢেউ-ফেনা মাখিয়া ডানায়
সীগাল পাখিরা তখন অঙ্গের জ্বালা মেটাতে শেখে নি।
সে অনেক আগের কাহিনী।

উপরে আকাশ, হয়তো সে নীল নয় আজকের মতো,
হয়তো সে ছিল বিচিত্র বর্ণের ডোরাকাটা চিত্রল শামুক।
নিচে মাটি, হয়তো সে মাটি নয় আজকের মতো,
ছিল রুক্ষ্মলাল কঠিন পাথর। মাঝখানে জল,
শুধু জল, শুধু জল অবিরল।

আকাশের টলমল চোখ থেকে খ'সে-পড়া যেন স্বর্গসুধা।
বায়ুস্তর ছিন্ন ক'রে ঝরে-পড়া জলবিন্দুখানি
আজ বড় বেশি জলে মিশে গেছে -
তাকে খুজে পাওয়া আজকে কঠিন।

তবু আমি যতবার সমুদ্রের কাছে যাই
ততবার তাকে পাই—বুঝি সে জাগ্রত হয়, নড়ে ওঠে
আমার আত্মায়। তখন হঠাৎ মনে পড়ে যায়, এইসব
নৈশোখিত নুড়ির মেলায় একদিন আমিও ছিলাম।
বালিতে আশ্রয় খুঁজে এই যে নিরক্ত জেলীফিস্
জোয়ারের অপেক্ষায় প'ড়ে আছে তটরেখাজুড়ে—
তার প্রতীক্ষার মতো কান পেতে জাগ্রত শৈবালদলে,
ঢেউয়ের ফেনায় মিশে একদিন আমিও ছিলাম।

হে সিন্ধু, হে বন্ধু মোর, হে মোর জননী,
তুমি ব'লে দাও তোমার সজলগর্ভে কীরূপে ছিলাম ?
সে কি নুড়ি ? শৈবাল ? পাথর ? নাকি ঢেউ ?
প্রাণহীন জীবনের সেই দীর্ঘ দিনরাত্রিগুলি পাড়ি দিয়ে
প্রথম যেদিন প্রাণের উৎসবে তুমি হলে গর্ভবতী—
সেদিনের কোনো স্মৃতি পড়ে না কি মনে ?
কোনো চিহ্ন, কোনো শব্দ, কোনো অনুভূতি
পড়ে না কি মনে ?
জাগে না কি কোনো শিহরন যখন তোমার বুকে
আমি এসে রৌদ্রতপ্ত মুখখানি রাখি,
মাতৃ-সম্বোধনে আবার তোমাকে ডাকি, মা।

আমিতো আসি নি ছেড়ে প্রিয়তম সেই জন্মস্থল
তুমিই দিয়েছো খুলে দ্বার ;
দিয়েছো পৃথিবীজুড়ে সহজমুক্তির অধিকার।
আজ কেন তবে পুনর্বার শোকাতুর জননী ? ব্যগ্রবাহু মেলে
আমাকে জড়াবে ব'লে ছুটে আসো ধেয়ে ?

ফিরে যাও হে তরঙ্গ, তৃষিত জলধি, সিন্ধুমাতা—
আমি ভালো আছি, নতুন আশ্রয় পেয়ে সুখে আছি
মৃত্তিকার বুকে। বিরহের তীব্র শোক নিয়ে তুমি ছুটে যাও
যেখানে তোমার সাধ, আমাকে থাকতে দাও আমার মতন।

আমি মাঝে মাঝে অবসরমতো এসে
তোমার বিরহমূর্তি দেখে যাবো,
শুনে যাবো তোমার বিরতিহীন করুণ কান্নার শোঁ-শোঁ ধ্বনি।
মাঝে মাঝে এসে তোমার সৈকতজুড়ে লিখে যাবো নাম,
যদিও পলকে তুমি ব্যস্তহাতে সেই নাম
মুহূর্তেই মুছে দেবে জানি।

কালোমেঘ

যখন আষাঢের কালোমেঘ থৈ-থৈ করে আকাশে,
যখন বৃষ্টি নামে অঝোর ধারায়, যখন চলন্ত ট্রেনের
জানালায় সেই বৃষ্টির ঝাপট এসে লাগে—
আমার খুব ভালো লাগে বাইরে তাকিয়ে আকাশ দেখতে।
ট্রেন ছোটে ছন্দিত বৃষ্টির সাথে তাল ঠুকে-ঠুকে,
বৃষ্টি তো নয় যেন আকাশ উপচে পড়া কবিতার ফেনা,
মনে হয় হৃদয় মেঘের সাথে উড়ে চলে দিগন্তের পানে।

হঠাৎ সমস্ত ছন্দ, সব তন্ময়তা ভেঙে দিয়ে -
পথের পাশের বস্তি থেকে ভেসে আসে নবজাতকের কান্না।
সেই কান্না জানালার বৃষ্টিভেজা কাচে এসে লাগে।
তার তুলতুলে মেঘের শরীর নিয়ে উড়ে আসে শিশুমুখ।
মনে পড়ে নিজের কন্যার কথা। একদিন এমনি সন্ধ্যায়
সে জন্মেছিল হাসপাতালের এক সুদৃশ্য কেবিনে।
তাকে স্বাগত জানিয়েছিল একজন অভিজ্ঞ ডাক্তার,
আর একদল শুভ্রবস্ত্রপরিহিতা নার্স।
কিন্তু এই নরকসদৃশবস্তিতে, আষাঢ়ের এই নির্দয় বর্ষণে
এ তোমার কেমন জন্ম মা -

আমার আদুরে কন্যার জন্মের আনন্দ-ধারায়
কেন যে তোমার জন্মের বেদনা এসে মেশে।
তোমার কান্নার শব্দে আনন্দের ছন্দ যায় মিলিয়ে,
সঙ্গীতের তাল যায় কেটে।
আষাঢ়ের মেঘপুঞ্জ হয়ে ওঠে ধোঁয়ার কুণ্ডলি,
বৃষ্টি হয়ে ওঠে জননীর বিগলিত অশ্রুধারা,
আনন্দকে মনে হয় ব্যঙ্গবিদ্রূপের বলি।

বৃষ্টি-পিছল রেলের সঙ্গে চাকার ঘর্ষণে
তখন কেবলি বেজে যায় : 'কী অন্যায়! কী অন্যায়!

খেলনাহাতির পুনর্জাগরণ

কন্যার জন্যে তিরিশ টাকায় একটা প্লাস্টিকের হাতি
কিনে এনেছে আমার স্ত্রী। তার তুলতুলে নরম শরীর,
বিস্ফারিত চোখ দু'খানা যেন স্নিগ্ধ প্রশান্তিতে ভরা।
উঁচানো শুঁড়ের ওপর লালরঙের প্রলেপ, তালপাতার
পাখার মতো মস্ত দুটো কান, তাতে হলুদের ছোঁয়া,
যেন গায়ে-হলুদের পিঁড়ি থেকে উঠে এসেছে বর।
তার কনেটি রয়ে গেছে কোন্ দূর বনে, কে জানে?

তার সদাহাস্যময় মুখের দিকে তাকালে ঈর্ষা হয়,
আহা কী নিশ্চিন্ত আনন্দেই না আছে সে—
এমন আনন্দিত মানুষ আজকাল পৃথিবীতে প্রায় নেই।
যিনি তৈরী করেছেন, তিনি যে গোজা দেননি সুঁড়ে
তা ঐ প্লাস্টিকের হাতির সাথে আমাদের
সাযুজ্যের কথা ভেবেই।

আমার কন্যাটি ভাবে হাতিটির কিছু খাদ্যের দরকার,
তাই সে হাতিটিকে বোতলের দুধ খাওয়াতে কসরৎ করে
মাঝে মাঝে—মনে হয় হাতিটি যেন মাতৃক্রোড়ে শিশু।
কিন্তু ওর দেয়া দুধ কিম্বা জল কোনোটাই পৌঁছে না
সেলোফিন-পেপারে বন্দী হাতিটির নির্বিকার মুখে।
বুঝি, মানুষের কাছে তার দাবি নেই কোনো
সে বুঝে গেছে তার দাবি মেটাবার সাধ্য নেই মানুষের।
তাই মাঝে মাঝে তার রহস্যজড়িত চোখের কোণায়
ঝিলিক দিয়ে ওঠে বিদ্রূপের শিখা।

বলতে পারেন এ হচ্ছে নিছক কল্পনার ফানুস,
প্লাস্টিকের হাতি কি আর বিশ-শতকের
সমাজসচেতন মানুষ?
না হয় ধরেই নিন এই হাতি হচ্ছে প্রতীক,
ঠিক কিসের সঙ্গে সে মিলবে তা না হয় নির্ভর করুক
আপাতত পাঠকের উপর—তারপর ঘটুক প্রতীকের মুক্তি।

২

গতরাত একটি স্বপ্ন দেখলাম।
আমি নিরাপদ প্লাস্টিকের একপাল হাতিকে
তাড়িয়ে নিয়ে যাচ্ছি আমার হাতিশালার দিকে।
আমার হাতে হাতি-নিয়ন্ত্রণের ধারালো অংকুশ—
সম্ভাব্য বিদ্রোহীর মাথায় তা দিয়ে আমি হেনে চলেছি
আগাম আঘাত।
সুতরাং সার্কাসের বিনীত হাতিদের মতই ওরা
চলছে আমার প্রতিটি নির্দেশ শিরোধার্য ক'রে;
যেন গোটা-পৃথিবীটাই আমার আজ্ঞার অধীন।

কিন্তু হঠাৎ কী যে হলো!
হাতির কানে লাগলো কালবৈশাখীর মাতাল হাওয়া।
তাদের চোখের জল উঠলো সমুদ্রের মতো ফুঁসে,
বনবাদাড়ের বৃক্ষপত্রে জাগলো অস্থির দোলা,
আকাশের রঙ গেলো বদলে—আর সেই পরিবর্তিত
অবস্থার সাথে তাল মিলিয়ে শুরু হলো রক্তবৃষ্টি।
আমার পোষমানা হাতির পাল একসাথে
গর্জন ক'রে উঠলো পোষ না-মানা বন্যহাতিদের মতো।
ওদের অর্ধনামত পতাকাসদৃশ শুঁড়গুলি
রক্তবর্ণ আকাশের স্পর্শ পেতে উর্ধমুখী হলো।
দু'পায়ে ভর রেখে ওরা নাচতে শুরু করলো আমাকে ঘিরে।

মূর্ছা যাবার আগে আমি দেখলাম ওদের রক্তবর্ণ
চোখগুলো উত্তপ্ত লোহার মতো ঝলসে উঠছে।
'বাঁচাও'—প্রাণভয়ে চিরপরিচিত এই শব্দটি উচ্চারণ ক'রে
আমি লাফিয়ে উঠে বসলাম আমার নিঃসঙ্গ বিছানায়।
দুঃস্বপ্নের মতো অস্ফুট সেই আওয়াজে নিদ্রা ভঙ্গ হলো না
অন্য কারো। অন্ধকারে আলো জ্বাললাম আর তখনই
চোখে পড়লো সেই প্লাস্টিকের হাতিটি।
সে তখন আমার দিকে তাকিয়ে তাকিয়ে হাসছে।

নাস্তিক

নেই স্বর্গলোভ কিম্বা কল্প-নরকের ভয়,
অলীক সাফল্যমুক্ত কর্মমগ্ন পৃথিবী আমার।

চর্মচোখে যা যা দেখি,
শারীরিক ইন্দ্রিয় যা ধরে—তাকেই গ্রহণ করি।
জানি, নিরাকার অপ্রত্যক্ষ সে শুধু ছলনা,
বিশ্বাস করি না ভাগ্যে, দেবতার বরে।

আমার জগৎ মুগ্ধ বাস্তবের বস্তুপুঞ্জে ঠাসা।
তাই সে ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য, অতীন্দ্রিয় নয়।
অন্ধতার বধ্যভূমি আমার হৃদয়।

সেই শ্রেষ্ঠ মানব সন্তান যার মন মুক্ত ভগবান্।
আমার মস্তক নিত্য নত সেই নাস্তিকের তরে।

সমুদ্রস্নান

এখানে দাঁড়াও এসে চুপচাপ,
চোখ রাখো সমুদ্রের তরঙ্গচ্ছটায়।
দেখো ফেনার মুকুটপরা
দিগন্তউত্থলজলরাশি,
মুহূর্তে ছুটিয়া আসি
তোমার সৈকতে গাঁথা পায়
কী ক'রে লুটায়!

এখানে দাঁড়াও এসে চুপচাপ,
কান পাতো হাওয়ায় গভীরে—
প্রাণ ভ'রে শোন রুদ্র সমুদ্রের গান।
শ্যামের মুরলী আজি
অলক্ষ্যে উঠিছে বাজি রাধার বিরহে
কল্লোলিত সমুদ্রসমান।

এখানে দাঁড়াও এসে চুপচাপ,
বসো সমুদ্রবিবহীন তটতলে।
তারপর নেমে যাও, ধীরে ধীরে
নিজেকে নিক্ষেপ করো জলে।
ভেবো না আমার কথা,
সংসার-সমুদ্র থাক দূরে।
ক্ষুদ্রস্বার্থসংকুচিত বন্দীজীবনের
প্রাত্যহিক গ্লানির ভিতরে
প্রবেশ করিয়া রুদ্র সমুদ্রের ঢেউ
জরাজীর্ণ জীবনের তটে
আজ হানুক আঘাত দলে দলে।

হাওয়ায় উড়ুক চুল,
জলোচ্ছ্বাসে দেহের বল্কল
হোক এলোমেলো।

অন্তহীন অপেক্ষার শেষে
না হয় সমুদ্র আজ
তোমাকেই খুঁজে পেলো
অপসৃত আবরণে,
সৈকতের নির্জন সন্ধ্যায়।

ভুলে যাও তীরের দর্শক,
মনে করো কেউ নেই;
সমস্ত সমুদ্রজুড়ে তুমি
একা, নগ্ন, অনাবৃতা…
পাশে জনশূন্য বেলাভূমি।

আমার কবিতা : মুক্ত প্যালেস্টাইন
(কবি মঈন বেসিসো প্রিয়বরেষু)

হয়তো আমার কবিতা
তোমাদের চূড়ান্ত বিজয়ের সেই প্রত্যাশিত
মুহূর্তকে ছুঁতে চেয়েছিল;
এতদিন তাই সে আসে নি।

হয়তো আমার কবিতা
তোমাদের ঝঞ্ঝাক্ষুব্ধ জীবনের অন্তর্হিত
আনন্দকে ছুঁতে চেয়েছিল;
এতদিন তাই সে আসে নি।

হয়তো আমার কবিতা
তোমাদের ঘরে ফেরা উৎফুল্ল নাবিকের
আবেগের সাথী হ'তে চেয়েছিল;
এতদিন তাই সে আসে নি।

এতদিন সে ছিল শুধুই
তোমাদের অন্তহীন যাযাবর-যাতনার
একজন আহত দর্শক।

হয়তো আমার কবিতা
বৃন্তচ্যুত পুষ্পের অব্যক্ত চাহনির সাথে
তোমাদের শরণার্থী মুখশ্রীকে
চায় নি মেলাতে।

হয়তো আমার কবিতা
সন্তানহারা বিড়ালের করুণ কান্নার সাথে

তোমার বিপুল ঘৃণার আগুনে
ভস্ম হয়েছে তারা।

তোমার বনের পাখিকে যারাই
ভোলাতে চেয়েছে গান;
জননী, তোমার বক্ষ করিয়া খালি
যারাই তোমার রক্ত করেছে পান,
তাদের মুখেই সময় মেখেছে কালি।

বিপ্লবী, কবি, কমরেড হো চি মিন
গুঁড়িয়ে যায় নি তোমার পাহাড়গুলি,
শুকিয়ে যায় নি মেকং নদীর ধারা,
উত্তরে আজ মিলিয়াছে দক্ষিণ,
তোমার স্বপ্ন ধুলায় হয় নি হারা।

নাপাম বোমায় ভস্ম হয় নি মাটি,
বরং তাতেই পাথর হয়েছে সোনা।
যদিও ধ্বংসস্তূপের চিহ্ন মুছে
এখনো সকল মুখেতে ফুটে নি হাসি,
তবু সেই মুখ স্বপ্নের বীজে বোনা—
তাতেই সোনালি শস্য ফলায় চাষী।

পেছনে তোমার উজ্জ্বল ইতিহাস
সামনে অটল লক্ষ্য রয়েছে স্থির।
ট্রুয়ং-সনের গিরি-শৃঙ্গের মতো
যে-বীরের মাথা কখনো হয় না নত,
সেই তো সতত আরাধ্য পৃথিবীর।

তোমার জন্য আমার কবিতা নয়,
আমারই জন্য তুমি, তাই—
আমারই জন্য তোমার কবিতা রচি
বিশ্বসভায় তোমার মহিমা গাই।

দুই মায়ের গল্প

আমার মা আমাকে ধারণ করেছিলেন
তার কমলকোমল গর্ভে,
এমন আনন্দময় মধুর আশ্রয়
মানুষের ভাগ্যে আর নেই।
সেই অন্তহীন জন্মের আবেগ
শুধু মাতৃ-সম্বোধনে হয় না সম্পূর্ণ তৃপ্ত,
সে-সুখের কণামাত্র মেটে মাতৃনামে।

ইতর প্রাণীর সাথে মানবশিশুর
তেমন প্রার্থক্য নেই, তবু সে পৃথক হ'তে চায়।
সে চায় নতুন জন্ম; তার জন্য আরো এক
মাতৃগর্ভ চাই।
অস্ফুট ভাষায়, আকারে ইঙ্গিতে তাই
সে চায় জানান দিতে হৃদয়ের কথা।
ভাগ্য ভালো মানবশিশুর -তার জন্য
ধরার ধূলায় পাতা আছে দ্বিতীয় মাতার গর্ভ,
নৃত্যগীতকাব্যময় ভাষা।
ভাষা তাকে তুলে নেয়—মায়ের অধিক যত্নে
অসহায় সন্তানের মুখে ঢেলে দেয়
স্নেহমাখা বুকের পীযূষ।
অব্যক্ত কথার মালা গে'থে নিয়ে ভাষা
মানবশিশুর কণ্ঠে সযত্নে পরায়।
ফুটে ওঠে ধ্বনিপুঞ্জ; সুরে গড়া—
মাতৃনাম ধ'রে শিশু ডেকে ওঠে মা, মা ....

এ-দুই মায়ের মধ্যে পার্থক্য বুঝি না।

আমার বিশ্বস্ত কলমের প্রতি

(আবু জাফর শামসুদ্দীন শ্রদ্ধাস্পদেষু)

আমি অপেক্ষায় আছি সেই সুবর্ণ সময়ের
যখন আমার কলম আবার ঝলসে উঠবে
খররৌদ্রে খাপখোলা তলোয়ারের মতো।
হল-কর্ষণের মৌসুম শেষ হ'লে কৃষকের লাঙলের
ফলায় যেমন জং ধরে, তেমনি কলম আমার
মাঝে-মাঝে ছুটি চায়, মাঝে-মাঝে জং ধরে তার ফলায়।
একটি কাব্যগ্রন্থ লেখা হয়ে গেলে আমি তাকে
গেরস্তের মতো কিছুদিন গোয়ালে ঝুলিয়ে রাখি।
কিছুদিনের ছুটি মঞ্জুর করি তাকে -বলি,
একটু বিশ্রাম নাও হে কলম আমার-একটু
আরাম ক'রে জিরিয়ে নাও তুমি। কিন্তু দেখো
এই বিশ্রামের ফাঁকে আবার যেন ঘুমিয়ে পড়ো না।

তোমাকে আরো অনেক কবিতা লিখতে হবে,
অকর্ষিত কত জমি পড়ে আছে তোমার সামনে,
আরো কত বিদ্রোহের গান গাইতে হবে তোমাকে,
আরো কত অদম্য আশার বাণী......।
তুমি তার জন্য তৈরি থেকো-তোমার ক্ষণিক বিশ্রাম
হোক গেরিলাদের রণ-কৌশলের ছাঁচে সাজানো।

যদি কখনো পথের ক্লান্তিতে ঘুমিয়ে পড়ি আমি,
তোমার উপর রইলো আমাকে জাগিয়ে দেবার ভার।
কেননা তুমিই তো আমার প্রিয় পথ-প্রদর্শক—
যখনই কিছু লিখি আমি তুমিই থাকো আমার সামনে।
আমি শুধু হাল ধ'রে থাকার মতো তোমাকে শক্ত হাতে
ধ'রে রাখি পেছনে থেকে। তুমি চঞ্চল ঝর্নার মতো
তরতর ক'রে এগিয়ে যাও সামনের দিকে—
কী অপূর্ব তোমার সেই চলার ছন্দ, চমৎকার,
ঠিক যেমনটি আমি চাই।

আজ এই বিশ্রামের অবকাশে—এক ফসল থেকে
আরেক ফসলের দূরত্ব কাটাতে, এসো,
আমরা কিছু সহজ আনন্দের গান গেয়ে নিই।
ভাটিয়ালী, ভাওয়াইয়া, বাউল, মুর্শিদী নাকি
মাথুর-কীর্তন শোনাবে তুমি ?
গাজীর গীত ? হ্যাঁ, তাও গাইতে পারো।
দু'পায়ে ঘুঙুর বেঁধে আজ আমি তোমার সঙ্গে
নাচতেও রাজী আছি। এসো কোমার দুলিয়ে আজ
একটু ঘাটুনাচ নেচে নিই আমরা।
তাতে কোমরের জং যাবে কেটে, বাত জমবে না হাঁটুতে,
চক্‌চকে থাকবে লাঙলের ফলা।
কর্মব্যস্ত কোদালের মতো তার ধারটাও থাকবে অটুট।
বাইরে বয়সের কিছু জং পড়লে পড়ুক, ক্ষতি নেই—
কিন্তু তোমার ভিতরে যেন সেই দুর্বিনীত ইস্পাত
থাকে লুকানো, যা-দিয়ে তুমি লিখবে ইস্পাতের মতো কাব্য।

যখন আকাশ রাঙা হয়ে উঠবে মেঘের ডাকে,
যখন মাটির প্রথম আহ্বান আসবে তোমার কানে,
তখন গর্তে-লুকোনো ব্যাঙের মতো মুহূর্তেই
যেন সাড়া দিতে পারো তুমি সে-আসন্ন যুদ্ধের ইঙ্গিতে।
ঈশা খাঁর ক্ষিপ্র-তলোয়ার বা সুপ্তোত্থিত কুম্ভকর্ণের মতো
যেন রুদ্রবেশে জাগ্রত হয় তোমার অন্তর।

যেন সমস্ত পৌরুষ নিয়ে, ভালোবাসা নিয়ে, ঘৃণা নিয়ে
তুমি এসে দাঁড়াতে পারো তাদের মিছিলে—
যারা জাল ফেলে মাছ ধরে মাঝ দরিয়ায়,
যারা চাষ করে জমি, রোদে জলে ফসল ফলায় বারোমাস,
যারা তাঁত বোনে, চালায় হাপর, গলায় লোহা,
যারা মাটির পাত্র গড়ে, মাথায় তুলে নেয় অপরের বোঝা,
যারা পাহাড় ভেঙ্গে তৈরী করে পথ।

যাদের সাহায্য ছাড়া সভ্যতার রথ হয়ে পড়ে অচল,
তোমার সচলকাব্য যেন তাদের স্বপ্নের মতো প্রতিদিন
বিদ্রোহের গোলাপ ফোটায়।

মনে রেখো, কল্পনাবিলাসী কবির হাতের স্বপ্নে-পাওয়া
খেলনা পিস্তল নও তুমি।
তুমি আমার সবচেয়ে বিশ্বস্ত হাতিয়ার,......তুমি
দূর রাখালের হাতের সেই বাঁশি আকাশ থেকে
বজ্র ঝ'রে পড়ে যার সুরে।
মানুষের রক্ত, ঘাম ও স্বপ্নের বারুদ দিয়ে
আমি তোমাকে পুষেছি। তুমিই আমার সব।

দূরত্ব

'সায়গন থেকে কতদূরে হো চি মিন ?'
জিজ্ঞেস করলাম ডক্ ল্যাপ হোটেলের
সেই বৃদ্ধ বাবুর্চিকে—গত সতেরবছর ধ'রে
যিনি রয়েছেন এই হোটেলের কাজে।
আমাকে শুধরে দিয়ে তিনি বললেন :
'ভুল করছো তুমি, ১৯৭৫-এর পর
এই সায়গনই হয়েছে হো চি মিন সিটি।'
এখন তো আর সেই মার্কিনীরা নেই,
তাই তাঁর মুখে বিজয়ীর হাসি।

আমার দোভাষী, উত্তরের তরুণ তিয়েন,
সে বললো : 'সায়গন হচ্ছে পরিচ্ছন্ন,
অর্থাৎ পবিত্র—মানে কুমারীত্ব যাকে বলে।'

সন্ধ্যায়, সুন্দরী রমণীঅধ্যুষিত এ্যাভিনিউ ধ'রে
আমরা দু'জন মার্কিনী বর্বরতার চিহ্ন দেখে-দেখে
পদব্রজে ফিরছি হোটেলে। এমন সময়,
মলিন পোশাকপরা একটি কিশোরী ছুটে এসে
ধরলো আমাকে : 'কেনো না একটা
চিনে বাদামের প্যাকেট'। ওর কণ্ঠে কোমল মিনতি।

আমার ছিল না স্থানীয় মুদ্রা অথবা ডলার,
তাই বললাম : 'আমি এক দরিদ্র বিদেশী,
সঙ্গে নেই টাকা—কিনবো কী দিয়ে ?'
সে তার বিস্ময়ভরা চোখ দুটো মেলে ধরলো
আমার উপরে। যেন সন্ধ্যা তার অন্ধকার খোপা
খুলে দিলো নর্তকীর মতো।

'টাকা নেই ? কী দেশ তোমার ?'
মেয়েটি ইংরেজী বেশ জানে।
আমি দেখতে চাইলাম ওর প্রতিক্রিয়া।
তাই বললাম মিথ্যে ক'রে : 'আমেরিকা'।

'আমেরিকা ?' শব্দটিকে মুচকি হাসিতে
সে উড়িয়ে দিলো প্রাক্তন সায়গনের আকাশ-সীমায়।
'মিথ্যে কথা, অসভ্য শ্বেতাঙ্গ নও তুমি।'
ওর উচ্চারণে ঘৃণার আভাস।

'তুমি চিনতে নাকি ওদের ?' প্রশ্ন করলাম আমি।
দীর্ঘশ্বাস ছেড়ে বললে মেয়েটি : 'হ্যাঁ, এদেরই একজন
ছিলেন আমার পিতা।'
পথের পাশের অচেনা গাছের পাতার আড়াল থেকে
তখন ডেকে উঠলো একটি পাখি : ছি-ছি-ছি-ছি...।
অচল ঘড়ির মতো আমার পা-দুটো তখন আটকে গেলো
ল্যাম সন্ স্কোয়ারের রক্তস্নাত পীচে।
'একদিনে কি দু'বার সূর্য ওঠে ?' বললাম স্বগত-স্বরে,
ক্ষীণ উচ্চারণে—দেখলাম ওর দুটি দক্ষিণ-পূর্ব
এশীয় নয়নে শুভ্রসমুজ্জ্বল দুই বিন্দু জল।

মনে পড়লো বাংলাদেশে রেখে আসা আমার
ছোট্ট মেয়েটির কথা,
মনে পড়লো আমার প্রিয়তমা স্ত্রীর পথ-চাওয়া
ম্লান মুখখানি।

অন্য-একজন বিদেশীকে দেখে মেয়েটি তখন দ্রুত
ছুটে গেলো রাস্তার ওপারে।
মনে হলো প্রাক্তন সায়গনের অকূল পাথার পাড়ি দিয়ে
মেয়েটি ছুটছে হো চি মিন সিটির উদ্দেশে।

কম্পুচিয়ার বধ্যভূমিতে দাঁড়িয়ে

আমরা যখন কন্ডালের বধ্যভূমিতে পৌঁচেছি
তখন দুপুর।
আমাদের চারপাশে চিক্‌চিক্ করছে রোদ্দুর,
শোঁ-শোঁ করছে হাওয়া।
নারকেল, তাল, বাঁশ, বট আর আঁশ-শেওড়ার
ঘনঝোপে ছাওয়া যেন বাংলাদেশেরই কোনো
ছায়াসুনিবিড় গ্রাম।

আমাদের স্বাগত জানালো একদল জীবন্ত মানুষ,
সারিবদ্ধ একদল হাস্যোচ্ছল কিশোর-কিশোরী।
যেন পথের দু'পাশে ফোটা নব-বসন্তের ফুল।
ওরা হাততালি দিতে পারে, অতিথির হাতে
তুলে দিতে পারে টাটকা ফুলের তোড়া,
চোখের কোণায় ওরা ফুটিয়ে তুলতে পারে
আনন্দ-বিষাদ। যদিও ওদের ভাষা আমরা বুঝি না,
তবু বুঝি, সে-বিষাদ আজ উড়ে গেছে আনন্দের রোদে।
করস্পর্শে, অনুভবে সঞ্চারিত হয় সেই শিহরন,
কখনো-বা উচ্চকিত দৃষ্টি-বিনিময়ে।

কিন্তু তারপর আমরা যেখানে গিয়ে দাঁড়লাম
সেখানে পৃথিবী স্থির,
হাসি নেই,
গান নেই,
ফুল নেই,
করস্পর্শ নেই—
অজস্র খুলির ভিড়ে ঠাসা একখানি চিরমৃত গৃহ,
শুধু খুলি আর খুলিতে সাজানো, যেন খুলিঘর।
একসঙ্গে এত খুলি কে কবে দেখেছে ?
কারো মুখে দাঁত আছে
কারো মুখে নেই

কারো চোখে বস্ত্র বাঁধা রয়েছে এখনো
কারো চোখে ভয়ার্ত গহ্বর
কারো-বা চোয়াল ভাঙা
কারো আছে তেমনি অটুট
কারো খুলি নিটোল মসৃণ
কোনাটি-বা বিচূর্ণ পাতিল ..
যেন ছোট-ছোট হাঁড়িভর্তি একখানি কুমোরের নাও
ভাসছে নদীতে - নাকি পথিপার্শ্বে তর্মুজের স্তূপ ?
এখানে পৃথিবী মৃত, জীবিতের বিবেক নিশ্চুপ।

ঘাতকের আছে ভিন্ন-ভিন্ন ভাষা, বিভিন্ন দর্শন :
যেমন বেগিন, পল-পট, ইয়াহিয়া কিম্বা হিটলার।
কিন্তু হায় পৃথিবীর সমস্ত খুলির ভাষা এক,
তারা কথা বলে প্রকৃতির নীরব ভাষায়।

খুলিদের চোখ নেই, আছে আবিষ্কৃত
গণ-কবরের মতো নিশ্ছিদ্র আঁধারে মোড়া গর্ত,
সেখানে দিনের রৌদ্র, রাতের আঁধার খেলা করে।
অতিথিকে স্বাগত জানিয়ে ওরা ঢলে পড়ে এ-ওর উপরে,
দমকা বাতাসে যেন দুলে ওঠে দীপের করোটি।

এক দুই তিন চার পাঁচ ছয়—কতগুলি হবে ?
কেউ কি গুনতে পারে মেঘমুক্ত আকাশের তারা ?
বুঝি প্রাণছাড়ামানুষের খুলি গোনা অর্থহীন,
তবুও কখন যেন গুনতে গুনতে ভাবি, একদিন
এরাও মানুষ ছিল, ছিল অস্থিমজ্জা মুখরিত
জীবনের নানাবিধ দাবি এই পৃথিবীর কাছে।
এখন কিছুই নেই, শুধু খুলিটুকু অবশিষ্ট আছে।

কঙ্কালের স্তম্ভিত আকাশে শুনি হন্তারক অতীতের
প্রেতবিদ্ধ হাসি। খুলির ভিতরে জাগে নবজীবনের গান,
কঠিন-চীবর দান সাঙ্গ ক'রে উঠে আসে মঠের সন্ন্যাসী।

ফেরার সময় মনে হয় আমাদের বিবেকী হৃদয়
দলিত মথিত একটুকরো কাগজ ছাড়া আর কিছু নয়।

এইসব খুলি আর কোনোদিন মানুষ হবে না,
অথচ একদিন এর প্রতিটি খুলিতে ছিল একটি মানুষ;
এই সত্য মনে হয় মিথ্যে হ'লে বাঁচি।

নেত্রকোণা

(খালেকদাদ চৌধুরী শ্রদ্ধাস্পদেষু)

সে-এক সময় ছিল মহানন্দময়
তার কেন্দ্রে ছিলে তুমি;
সমর্পিত, পক্বকেশ, প্রবীণ-লেখক
সাহিত্যের পাদপদ্মে আনত আভূমি।

স্নেহবৎসল, তাম্বূলরঞ্জিত মুখে
জর্দার সুরভিমাখা শ্বাস;
প্রযত্নে সিদ্দিক প্রেস, কোর্ট রোড,
সম্পাদক : 'উত্তর আকাশ'।

তাকে ঘিরে আমাদের আনন্দ উৎসব,
পর্বতস্মৃতির গাত্রে লেখা আছে সব।

সেই মুগ্ধ স্মৃতির সন্ধানে
অপসৃত অতীতের টানে
যখন তাকাই ফিরে, মনে পড়ে
ক্ষীণস্রোতা মগ্রা নদীটিরে।
কতদিন এর তীরে ব'সে
রচনা করেছি কাব্য মনের হরষে;
অলিখিত সে-সব কাহিনী
রাতের তারার মতো
দিনাকাশে মিশে আছে জানি।

ছিল দেবযানী, বেনুমতী সে আমার।
আমি কচ, কর্তব্যে নিষ্ঠুর, প্রেমে
পরাঙ্মুখ, পাষাণ-হৃদয় এক কবি।
উপেক্ষা করেছি যার গোপন প্রণয়,

গোপনে হৃদয় আজো আঁকে তারই ছবি
নিশিদিন মনের আকাকে।

মুহূর্ত স্মরণমাত্র তাই সে সতত
হৃদয়ে জাগ্রত হয়
সচকিত বিদ্যুতের মতো দীর্ঘশ্বাসে।
বুঝি, যা ছিল সে আজো আছে তাই,
আমি তার কিছু ভুলি নাই।

মনে পড়ে, অপটুহাতের আঁকা
স্মৃতির রুমালে বোনা
আমার প্রথম প্রেম, প্রথম গোলাপ,
মহুয়া সুন্দরী, নেত্রকোণা।

আফ্রিকার চিঠি

(কবি নিয়াম্যানগাব্রিয়ার উদ্দেশে)

আজ জিম্বাবুই থেকে বাংলার প্রত্যন্ত পল্লীতে
পরিব্যাপ্ত হলো নববর্ষ। তোমার শুভেচ্ছা নিয়ে
উড়ে এলো দূরের বাতাস—রাতের শুভেচ্ছা নিয়ে
দিনের পিয়ন যেন উঁকি দিলো পূবের আকাশে।

খামের ভিতরে পুরে তুমি পাঠিয়েছো আফ্রিকার
হাওয়া, নীলকাশে ডানা মেলে তাতেই উড়াল দিলো
আমার হৃদয়। আমি স্বপ্নাবিষ্ট পৃথিবীর পাখি,
ভারতসাগর পাড়ি দিয়ে মেঘ ফুঁড়ে উড়ে যাচ্ছি
জোহান্সবার্গের শ্রমিক বস্তিতে, ডাকার বন্দরে...

আমার গৃহটি যেন হো-চি-মিন শহরের সেই
সুসজ্জিত কনফারেন্স হল -যেখানে বর্ণানুক্রমে
সাজানো আসনে বসে আমরা শুনেছি বর্ণবাদী
আফ্রিকার নির্বাসিত গল্পকার গুমা-র ভাষণ।

'হ্যালো আফ্রিকা, হ্যাভ ইউ ফিনিশড্ ইয়োর পোয়েম ?'
'ওহ্, নো-নো, নট ইয়েট, নট ইয়েট।'
'উই স্যাল ওভারকাম ওয়ান ডে' –বিধ্বস্ত কাম্পুচিয়ার
বধ্যভূমিতে দাঁড়িয়ে আমরা গাইছি নবজীবনের গান।
হ্যানয়ের কবিতা মেলায় আমরা আবৃত্তি করছি কবিতা।

ফেলে আসা অন্তরঙ্গ স্মৃতির আকাশ খুঁড়ে খুঁড়ে
আমার বিপন্ন করতল ক্রমশ রূপান্তরিত হলো
এক অলৌকিক গোলাপ বাগানে।
তোমার চিঠিটি যেন অদ্যফোটা স্মৃতির গোলাপ
টকটকে লাল, তাজা, ঘ্রাণময়।
সেই গোলাপের গভীরে তাকিয়ে আমি দেখলাম :
আলজিরিয়ার কবি আহমেদ হামদী
এঙ্গোলার এন্টোনিও কারদাসো
কঙ্গোর লিওপোল্ড

ঘানার ওকাই
ইথিওপিয়ার আসেফা গেব্রি মরিয়ম
তিউনিসিয়ার মোস্তফা ফেরসি
মোজাম্বিকের রাউল দা সিলভা
জাম্বিয়ার মোসেস কুয়ালী
সিয়েরে-লীয়নের কল্‌সো জসেন
মরোক্কোর মোহাম্মদ বাররাদা...........
যেন ভাঙ্গা আয়নার কাচে মুক্তিকামী আফ্রিকার
একগুচ্ছ ছড়ানোছিটানো মুখ।

আমি সেই মুখগুলো একত্রিত ক'রে গাঁথলাম
নব-আফ্রিকার একখানি ধ্যানমৌন মালা।
আমি দেখলাম পিকাসোর শান্তি-কপোতের মতো
কালোঘোমটার অন্তরালে তোমার মানবরূপ -
সারল্যের উজ্জ্বল ঐশ্বর্যে প্রস্ফুটিত চঞ্চল যৌবন।
আমি প্রেমে পড়লাম কালো আফ্রিকার।
প্রিয়মিলনের স্বপ্নাচ্ছন্ন ঘোরে আমি শুনতে পেলাম
মুক্তির উদাত্ত কণ্ঠ, দরোজায় তর্জনীর টোকা -যেন
ঘৃণার অতীত রাত্রি পাড়ি দিয়ে ফিরে আসা প্রেম।

সামনে পথের বাঁকে অজস্র কন্টক আছে জানি,
তাই, তোমার উদ্দেশে আজ আমিও পাঠাই বাণী :
'দস্যুপায়ের কাঁটামারা জুতোর তলায় দলিত-আফ্রিকা,
শতাব্দীর শোষিত-আফ্রিকা, লাঞ্ছিত-আফ্রিকা, কমরেড্‌,
এসো, অভিন্নযাতনাবিদ্ধ এশিয়ার হাতে হাত ধ'রে
সভ্যের বর্বর লোভ আমরা থামিয়ে দিই চিরতরে।'

কালোমেনস্কায়া
(দ্বিজেন দা ও দেবী বৌদিকে)

কে যেন আমায় স্বপ্নের ঘোরে টেনে নিয়ে যায়
মাটির তলায়, বুঝি নিদ্রিত মস্কোর মায়া ;
আমিও হঠাৎ ধোপাখোলা থেকে মেট্রোতে চ'ড়ে
চোখের পলকে পাখি হয়ে যাই কালোমেনস্কায়া।

কন্‌কনে শীতে বরফ গুঁড়িয়ে পথ হাঁটি নানা
দৃশ্য কুড়িয়ে, যেন সে আমার ভালোবাসা দিয়ে
ঢাকা পথখানি। ভাবটা দেখাই নবাগত নই,
মস্কোকে আমি লেনার মতই বেশ ভালো জানি।

যদিও আমার দৌড়ের সীমা খুব দূরে নয়...
তবু মনে হয় ওক্, পপলার, ম্যপেলের ছায়া
যেখানে মিশেছে, অনায়াসে আমি পাঁচ কোপেকেই
ফিরে পাবো সেই সান্ধ্যকুসুম, কালোমেনস্কায়া।

টেলিফোন-বুথে ব্যস্ত যুবতী, বুড়ো-বুড়ি আর
রুশী বাচ্চারা থাকবে তাকিয়ে—যেন সম্প্রতি
এরকম আর কাউকে দেখে নি। দেখবে কী ক'রে ?
এতদিন আমি লুকিয়ে ছিলাম ফুলের শিকড়ে।
এবার ফুটেছে ফুল মস্কোর শীতের ছোঁয়ায়,
বরফ যেখানে জননীর মতো আকাশ ধোয়ায়।

আমি কেন একা তোমাকে দেখবো ? তোমার দু'খানি
নীল নয়নে তো পড়েছে আমারো ছায়া,
আমার প্রেমেও মাতাল হয়েছে পাতাল রেলের
চপলা হরিণী মেয়ে, কালোমেনস্কায়া।